হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 3, Issue No. 10, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, May 2014

হিন্দু সংগঠিত, শক্তিশালী এবং সংখ্যাগুরু না থাকলে শুধু তার ধর্মই লাঞ্ছিত হয় না, তার জীবন, সম্পত্তিও নিরাপদ থাকে না। এ শুধু পূর্ববঙ্গ কিংবা পাকিস্তানের ইতিহাস নয়। এক হাজার বছরের ইতিহাস।

—শিবপ্রসাদ রায়

সম্পূর্ণ পরিকল্পিতভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে খুন করা হল ডাক্তার মৃত্যুঞ্জয় পুরকাইতকে

চেম্বারের মেঝেতে নিহত ডাঃ মৃত্যুঞ্জয় পুরকাইতের রক্তের দাগ। ইনসেটে ডাঃ মৃত্যুঞ্জয় পুরকাইত।

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় সরারহাটের কার্তিক মেথিয়ার পর আবার পরিকল্পিতভাবে খুন করা হল ডাক্তার মৃত্যুঞ্জয় পুরকাইতকে (৪৫) (পিতা ঁউষাচরণ পুরকাইত)। ঘটনাটি ঘটে রবিবার, ২৭শে এপ্রিল। কুলতলি থানার অন্তর্গত দেউলবাড়ি দেবীপুর অঞ্চলে মানিকপীরের মোড়ের কাঁটামারি গ্রামে। মৃত্যুঞ্জয়বাবু এলাকায় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। আশপাশের অঞ্চলের মানুষ নানাভাবে তাঁর দ্বারা উপকৃত হত। এহেন একজন সমাজসেবীকে কেন দুষ্কৃতির হাতে খুন হতে হল, তা নিয়ে এলাকার অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন।

অন্যান্য দিনের মত মৃত্যুঞ্জয়বাবু তাঁর চেম্বারে রোগী দেখছিলেন। তখন সকাল ৯টা-সাড়ে ৯টা হবে। চেম্বারে অল্পবিস্তর লোক রয়েছে। ডাক্তারবাবু জবা গাইন নামক এক মহিলাকে দেখছিলেন এবং তার পাশেই বসেছিলেন দেবপ্রসাদ তাঁতী। এমন সময় আব্দুল করিম (পিতা হাসেম ঢালী) নামক এক যুবক একহাতে রামদা ও অপর হাতে বন্দুক নিয়ে চেম্বারে প্রবেশ করে। কেউ কিছু বোঝার আগেই পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে সে গুলি করে মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তারকে। গুলি বুকের বাঁ দিকে লাগে। রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি লুটিয়ে পড়েন। ঘটনার আকস্মিকতায় থতমত খেলেও আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে জবা দেবী, তাঁর চিৎকার শুনে চিত্তরঞ্জন হালদার, প্রদীপ প্রামাণিক ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। তারা দেখেন বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আব্দুল করিম এবং চেম্বারের মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন মৃতুঞ্জয়বাবু। করিম সবাইকে গুলি করার ভয় দেখিয়ে সেখান থেকে পালায়। খবর পেয়ে এলাকায় লোক জড়ো হয় এবং তারা আব্দুল করিমকে তাড়া করেন। ততক্ষণে করিম নিজ এলাকার এক বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। তাকে সেখানে ধরতে গেলে বাড়ির মহিলারা ঝাঁটা-বঁটি প্রভৃতি নিয়ে তাদের বাধা দেয়। মহিলাদের কাছে বাধা পেয়ে এলাকাবাসী কিছুটা পিছু হটলে সেই সুযোগে আব্দুল করিম পালায়। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত হয়। আব্দুল করিম পালানোর খবরে এলাকাবাসী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং তাদের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে ঐ মহিলাদের উপর। মহিলাদের দুজনকে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে বলে এলাকাবাসী দাবি জানায়। এ নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বচসা হলে ক্ষিপ্ত জনতা পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করে। এরপর পুলিশ দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিলে জনতা কিছুটা শান্ত হয়। ঐ দিন বিকালেই পুলিশ খুনি আব্দুল করিমকে গ্রেপ্তার করে। মৃত মৃতুঞ্জয়বাবুর শ্বশুরমশাই সুবল নাইয়া (৫৯) দুষ্কৃতি আব্দুল করিমের নামে কুলতলি থানায় একটি কেস দায়ের করেন। কেস নম্বর ২২১/১৪, ২৭-৪-১৪। মৃত্যুঞ্জয় বাবুর স্ত্রী এবং এক পুত্র ও এক কন্যা বর্তমান।

কিন্তু কেন খুন হতে হল ডাক্তার মৃত্যুঞ্জয় পুরকাইতকে। একটি সূত্রের খবর বেশ কিছুদিন আগে আব্দুল করিম তার চারমাসের শিশুর চিকিৎসার জন্য মৃত্যুঞ্জয়বাবুর কাছে আনেন। কিন্তু প্রাথমিক চিকিৎসা করলেও গুরুতর অসুস্থ শিশুটিকে তিনি হাসপাতালে ভর্তি করার জন্য বাড়ির লোকদের বলেন। কোন কারণবশতঃ শিশুটিকে হাসপাতালে ভর্তি না করলে শিশুটি মারা যায়। করিমের যত রাগ গিয়ে পড়ে ডাক্তারের উপর। সে মৃত্যুঞ্জয় বাবুকে খুনের হুমকি দেয়। ডাক্তার মুসলিম সমাজের লোকদের বিষয়টি জানালেও তারা ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিতে না বলে। এরই মধ্যে ২৭ তারিখ, রবিবার সকালে আব্দুল করিম একটি রামদা

শেষাংশ ২ পাতায়

হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উপরে আঘাতের অপচেষ্টা রুখে দিল ভীমপুরের যুবকেরা

হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া থানার একটি গ্রাম ভীমপুর। ফুরফুরা অঞ্চলের এই গ্রামটিতে প্রতিবছর খুব ধুমধাম করে হয় শ্মশানকালী পূজা। প্রতি বছরের মত এবছরও শোভাযাত্রা করে প্রতিমা আনা হচ্ছিল পূজাস্থলে। ২রা এপ্রিল এই শোভাযাত্রা যখন ফুরফুরা তালতলা হাটের কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন স্থানীয় মুসলমানেরা এবং পুলিশ তাদের পথ আটকায়। তাদের বক্তব্য ছিল কবরস্থানের পাশ দিয়ে এই শোভাযাত্রাকে যেতে হবে নীরবে—মাইক এবং বাজনা বন্ধ করে। ভীমপুরের হিন্দু বাগদী সম্প্রদায়ের কাছে এটা ছিল এক নতুন অভিজ্ঞতা। কারণ এর আগে কোন বছর তাদের এই নিয়মটা পালন করতে হয়নি। এ বছর তাহলে হঠাৎ এই নিষেধাজ্ঞা কেন? সংখ্যালঘু মুসলমানদের সংখ্যা কোনো অঞ্চলে যত বাড়ে, তাদের নতুন নতুন আবদার—তা ন্যায়সঙ্গত বা যুক্তিসঙ্গত না হলেও বাকিরা তা মানতে বাধ্য হয়—এটাই সব ক্ষেত্রে আমরা দেখে থাকি। এদেশে এরই নাম ধর্মনিরপেক্ষতা। আর এরাজ্যে এই নতুন জমানায় দেখা যাচ্ছে সংখ্যালঘু মুসলমানদের ইচ্ছা মানেই আদেশ। সুতরাং এই নিষেধাজ্ঞার কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু ভীমপুরের হিন্দু যুবকেরা রুখে দাঁড়ায়। তাদের বক্তব্য, যেহেতু প্রতিবছর এই শোভাযাত্রা মাইক এবং বাজনা সহযোগে এই রাস্তা দিয়ে যায়, তাই এবছরও সেভাবেই যাবে। মুসলমানদের কবরস্থান আছে বলে রাস্তায় শোরগোল করা যাবে না—পুলিশের এই যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বক্তব্য, কিছুদিন আগে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার সময় যখন মুসলমানদের জলসা হচ্ছিল, তখন দিন রাত মাইক বাজছিল। পরীক্ষার্থীদের এই অসুবিধার সময় পুলিশ কোথায় ছিল? সুতরাং শোভাযাত্রা যাবে এবং মাইক ও বাজনা বাজবে। শোভাযাত্রা বন্ধ করার জন্য পুলিশ বলপ্রয়োগের চেষ্টা করলে ভীমপুরের যুবকরা পুলিশে উপরেই চড়াও হয়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে পুলিশসহ অন্যরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। অবশেষে সেই শোভাযাত্রা মাইক ও বাজনা বাজাতে বাজাতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছায়। স্থানীয় সূত্রের খবর, ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকী পুলিশ প্রশাসনকে ঐ বাজনা বন্ধ করাতে চাপ দিলে পুলিশ তাঁকে ঘটনাস্থলে যেতে বলে। তাতে তিনি পিছু হটেন এবং পুলিশও আর এগিয়ে যায় না।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার রাইদিঘি থানার আটেশ্বরতলায় রামনবমী উপলক্ষে বিরাট হিন্দু সম্মেলন

মঞ্চে উপস্থিত হিন্দু সংহতির সভাপতি ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার রাইদিঘি থানার আটেশ্বরতলায় মহাসমারোহে পালিত হল রামনবমী। ৮ এপ্রিল সারাদিন ব্যাপী রামপূজা উপলক্ষে যাগ-যজ্ঞ সহ অন্যান্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে এলাকার হিন্দু জনসাধারণের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মত। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল বিকালে আয়োজিত বিরাট হিন্দু সম্মেলন। সহস্রাধিক হিন্দুর উপস্থিতিতে এই সভায় প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ।

শ্রী ঘোষ তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে হিন্দুদের সামনে শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত শিক্ষার বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শ্রীরামচন্দ্র ছেলেবেলায় তাড়কা রাক্ষসী বধ থেকে শুরু করে রাবণ বধ পর্যন্ত---সারা জীবন অশুভ শক্তির

শেষাংশ ৪ পাতায়

আমাদের কথা

শাক দিয়ে কি মাছ ঢাকা যায় ?

হিন্দু সংহতি গত ছয় বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের স্থানে স্থানে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের অগণিত ঘটনা জনসমক্ষে তুলে ধরার চেষ্টা করলেও এই বাংলার প্রগতিশীল এবং প্রখর সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পন্ন মিডিয়াকুল অত্যন্ত সচেতনভাবে সেই সমস্ত সংবাদকে চেপে রেখেছে। দিকে দিকে হিন্দুর উপর ব্যাপক আক্রমণ, লুঠপাট, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, হত্যার খবর চেপে রাখার মহৎ উদ্দেশ্য—এই সমস্ত খবর প্রকাশিত হলে নাকি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়বে যা কখনই অভিপ্রেত নয়। অর্থাৎ হিন্দু অত্যাচারিত হোক, গৃহহীন হোক, হিন্দু নারী ধর্ষিতা হোক, মিডিয়াতে খবর প্রকাশিত হবে না। হলেও এমনভাবে হবে যাতে এর সাম্প্রদায়িক স্বরূপ কেউ টের না পায়। পাশাপাশি এক দশক আগের গুজরাট দাঙ্গা আজও খবর, মুজফরনগরের দাঙ্গা আজও খবর। কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত হিন্দুরা আজ কোথায়, কিভাবে আছে তা কেউ জানতে পারে না। কিন্তু মুজফরনগরের দাঙ্গাপীড়িত মুসলমানদের কষ্ট এই মুহূর্তে টেলিভিশনে কোন না কোন চ্যানেলে অবশ্যই দেখতে পাবেন। অর্থাৎ বিশ্ববাসীর সামনে এই চিত্রটা তুলে ধরা হচ্ছে যে এদেশে সংখ্যালঘু মুসলমানরা হিন্দুদের দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছে, যা বাস্তবের ঠিক বিপরীত। এর কারণ মিডিয়াগুলির বাজারী দায়বদ্ধতা। যাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় চ্যানেলগুলি এবং সংবাদপত্রগুলি চলে, তাদের কাছে এরা দায়বদ্ধ, সাংবাদিকতার নীতি অথবা তাদের সামাজিক ও জাতীয় কর্তব্যের কাছে নয়। কিন্তু টাকা খেয়ে সত্যকে চেপে রাখার চেষ্টা যতই হোক না কেন সত্য একদিন প্রকাশিত হয়। কারণ শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না, কোনদিন যায় নি আর যাবেও না। তাহলে বাস্তব কী? পুলিশ রিপোর্ট বলছে গ্রামবাংলায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ গত এক বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৮ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত যেখানে বছরে ১২ থেকে ৪০টা পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ঘটনা নথিবদ্ধ হয়েছে, সেখানে ২০১৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০৬-এ। আমাদের এই রাজ্য সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের নিরিখে দেশের প্রথম দশটি রাজ্যের মধ্যে একটি। অর্থাৎ গলা ছেড়ে সবাই মিলে প্রাণপণে ধর্মনিরপেক্ষতার গান গাওয়া সত্ত্বেও এরাজ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদভাব একটুও কমেনি, বরং উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কারণ কী? অভিজ্ঞরা বলছেন, বর্তমান রাজ্য সরকারের নগ্ন মুসলিম তোষণ এর অন্যতম কারণ। ইমাম ভাতা চালু করা, শুধুমাত্র মুসলমানদের দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন সরকারি স্কিম শুরু করা এবং সর্বোপরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোরখা পরিহিত ও নামাজরত চিত্রের ব্যাপক প্রচার সাম্প্রদায়িকতাকে খোলাখুলি প্রশ্রয় দেওয়া ছাড়া আর কী হতে পারে? State Minority Affairs Department-এর একজন পদাধিকারীর বক্তব্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ঘাসফুলের সরকার গঠন হওয়ার পরে কমপক্ষে চারশ-র বেশি মুসলিম NGO গজিয়ে উঠেছে, আগে থেকেই আছে ৫৯৭টি সরকার পঞ্জীকৃত মাদ্রাসা। শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থে আব্দুল বারিক বিশ্বাস, মুন্না ইকবাল, আরাবুল, সেলিম, খোড়া হাসেম, সাজাহান শেখদের মত দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ না নেওয়া এবং অতীতে সিমি'র মত সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ পদে অভিষিক্ত করা মুসলমানদের আগ্রাসী মানসিকতাকে পরিপুষ্ট করে তুলেছে বলে অনেকে মনে করছেন।

এই ব্যাখ্যা শতকরা একশ ভাগ সত্যি হলেও অসম্পূর্ণ। রাজ্যের যে সমস্ত এলাকা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষপ্রবণ, গত কয়েক বছরে সেই এলাকাগুলিতে হিন্দু সংহতির প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে এক দিকে বেড়েছে হিন্দুদের চেতনা এবং সাথে সাথে বেড়েছে তাদের সাহস ও আত্মবিশ্বাস। ফলে আগে যারা অত্যাচারিত হওয়ার পরে মুখ খুলত না, তারা আজ পুলিশে রিপোর্ট করার সাহস করছে। যে হিন্দুরা আগে অত্যাচারিত হলেও মুখ বুজে সহ্য করতে অভ্যস্ত ছিল, তারা আজ প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। অর্থাৎ, হিন্দুদের এই ঘুরে দাঁড়ানোর ফলে সংঘর্ষ হচ্ছে এবং পুলিশের খাতায় তা নথিবদ্ধ হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ঘটনার এই বৃদ্ধি উদ্বেগজনক হলেও এই পরিসংখ্যান হিন্দুদের কাছে একটা আশার বার্তা বহন করে আনছে কি না তা হয়তো সময়ই বলবে।

১ম পাতার শেষাংশ

পরিকল্পিতভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে খুন

ও বন্দুক নিয়ে এসে ডাক্তারবাবুকে চেম্বারের মধ্যেই গুলি করে। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যুঞ্জয়বাবুর মৃত্যু হয়।

কিন্তু এই খুনের পিছনে আসল উদ্দেশ্যটা ছিল অন্য। ডাক্তার মৃত্যুঞ্জয় পুরকাইত মানিকপীরের অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। বেশ ধনবানও। চেম্বারের পাশেই তাঁর আরও পনেরোটি দোতলা পাকা দোকান আছে। দোকানগুলি সবই ভাড়ায় দেওয়া। রুগীদের প্রতি সহৃদয় ছিলেন বলে সকলের কাছেই তিনি প্রিয় ছিলেন। সম্প্রতি তিনি একটি গাড়ি কিনেছিলেন যাতে কোন গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তিকে হাসপাতালে পৌঁছানো যায়। এমন একজন ব্যক্তিকে খুন হতে হল কেন, তা জানতে হিন্দু সংহতির একজন প্রতিনিধি কাঁটামারি গ্রামে গিয়েছিলেন। গ্রামবাসীদের কথায় উঠে এসেছে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। মৃত্যুঞ্জয়বাবু হিন্দু মানসিকতা সম্পন্ন ছিলেন। হিন্দুদের উপর কোন অত্যাচার হলে তিনি যেমন প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসতেন, তেমনি সাহায্যের হাতও বাড়িয়ে দিতেন। হিন্দুত্ববাদী বলে এলাকায় তাঁর জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আর এটাই হল কাল। আব্দুল করিমের শিশুর মৃত্যুর জন্য তার পরিচিতরা ডাক্তার

ডাঃ মৃত্যুঞ্জয় পুরকাইতের মৃত্যুতে শোকার্ত পরিবারবর্গ

পুরকাইতকেই দোষী করে। নিজেদের সমাজের লোকেদের প্ররোচনায় আব্দুল করিম মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে খুন করেছে বলে গ্রামবাসীরা সন্দেহ প্রকাশ করেছে। ডাক্তারবাবুকে যে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হল, এলাকাবাসীরা তাই জানিয়েছেন হিন্দু সংহতির প্রতিনিধিকে। এখন পুলিশ তদন্ত করে কোন তথ্য প্রকাশ করতে পারে কিনা, তাই দেখার।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় আদিবাসীদের বাসন্তীপূজার প্রতিমা লাথি মেরে ভেঙে ফেলা হল

গত ৯ এপ্রিল রাতে দঃ দিনাজপুর জেলার ধলাহাট গ্রামের আদিবাসীরা মুসলিম দুষ্কৃতিদের ভয়াবহ আক্রমণের শিকার হয় এবং তাদের বাসন্তীপূজার প্রতিমা লাথি মেরে ভেঙে ফেলা হয়।

বালুরঘাট মহকুমার হরিরামপুর থানার অন্তর্গত ধলাহাট গ্রামে আদিবাসী সাঁওতালদের বাস। বহুদিন থেকেই তারা বাসন্তীপূজা করে। ধলাহাট প্রাথমিক স্কুল প্রাঙ্গণে এই পূজা উপলক্ষে একটি ছোটখাটো মেলাও বসে। ৯ এপ্রিল ছিল চারদিন ব্যাপী এই পূজার দশমী ও শেষ দিন। রাত্রে বিসর্জন হওয়ার কথা। সন্ধ্যায় ভিড় একটু কম ছিল। সন্ধ্যা ৬-৩০ নাগাদ কয়েকজন মুসলিম এসে মেলা প্রাঙ্গণে জুয়ার আসর বসায়। পূজা কমিটির সদস্যরা খবর পেয়ে তাদেরকে জুয়া খেলা বন্ধ করতে বলে। এই মেলায় কোনদিনই জুয়া খেলার আসর বসে না। জুয়াড়িরা পূজা কমিটির কথা গ্রাহ্য করে না। তখন বচসা হয় এবং ধাক্কাধাক্কি হয়। মুহূর্তের মধ্যে ৪০-৫০ জন মুসলমান জড়ো হয়ে পূজা কমিটির অফিস আক্রমণ করে ও ভাঙচুর শুরু করে। তখন কমিটির মাত্র সাত আট জন সদস্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাই তারা এদের আটকাতে পারে না। দুর্বৃত্তরা অফিসের চেয়ার টেবিল ভাঙে, পূজা প্যাণ্ডেল তছনছ করে এবং লাথি মেরে বাসন্তী দেবীপ্রতিমা ভেঙে দেয়। কমিটির সদস্যরা বাধা দিতে গেলে লাঠি, হাঁসুয়া ও অন্যান্য ধারালো অস্ত্র দিয়ে দুষ্কৃতিরা তাদেরকে আঘাত করে। এই আক্রমণে প্রায় ১৬ জন হিন্দু আহত হয় এবং আদিবাসী মহিলাদের শ্লীলতাহানি করা হয়। আহতদের মধ্যে দিলীপ মুর্মু (৪০)-র মাথা ফেটেছে। তিনি এখন হরিরামপুর হাসপাতালে ভর্তি ও মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। অন্য আহতরা হলেন, গোবিন্দ মুর্মু (১৮), সায়লা সরেন (২০), ফালকু সরেন (২১), অনন্ত সরকার (২২), রবিন মুর্মু (২৮)। এদের সকলকেই হরিরামপুর হাসপাতাল থেকে চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পদমণি হাঁসদা (২৮), পিঙ্কি মুর্মু (৩০), সাইলি কিসকু (৩৫), এবং আরও কয়েকজন আদিবাসী মহিলা শ্লীলতাহানির শিকার হয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে এই আক্রমণে নেতৃত্ব দেয় মনোহরা ডাঙাপাড়া নিবাসী আনিকুল ইসলাম (পিতা-আনিসুর), সাদিকুল ইসলাম (পিতা-ঐ) এবং মিনারুল ইসলাম (পিতা-থাম্বা)।

এই ভয়াবহ আক্রমণের খবর পেয়ে কয়েকশত আদিবাসী ও অন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা জড়ো হয়। বাসন্তী ঠাকুরের ভাঙা মূর্তি দেখে এবং অত্যাচারের কথা জেনে তাদের ক্ষোভ চরমে ওঠে। দীর্ঘদিন ধরেই এরকম পরিস্থিতির তারা শিকার। বিশেষতঃ মেয়েদের উপর দুষ্কৃতিদের কুনজর তাদের কাছে খুব চিন্তার বিষয়। তাই সমবেত ভাবে কয়েকশ আদিবাসী গুরুত্বপূর্ণ ইটাহার-দৌলতপুর রাস্তা অবরোধ করে। দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে তাদের এই অবরোধ। ইতিমধ্যে হরিরামপুর থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ আসে কিন্তু অপরাধীদের গ্রেপ্তারে কোন তৎপরতা দেখায় না। রাত্রি প্রায় দুটোর সময় র‍্যাফ্ ঘটনাস্থলে আসে এবং কোন কথা না বলে রাস্তা অবরোধকারীদের উপর প্রচণ্ড লাঠিচার্জ শুরু করে। তাতে অনেক আদিবাসী গুরুতর আহত হয় এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সেই সুযোগে পুলিশ ভাঙা বাসন্তী প্রতিমা স্থানীয় একটি পুকুরে বিসর্জন দিয়ে দেয়। পুলিশের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা বলে যে, হিন্দু ও মুসলমান-দুপক্ষের লোককেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু স্থানীয়সূত্রে খবর, পুলিশ একজনও দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করতে না পারলেও ১১ জন আদিবাসীকে গ্রেপ্তার করেছে।

এই পশ্চাপদ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ততোধিক পশ্চাদপদ আদিবাসী সমাজ বহুবছর ধরে নয়, বহু দশক ধরে এইরকম অত্যাচারের শিকার। সবল নেতৃত্বের অভাবে এবং পুলিশ প্রশাসন ও পার্টির মুসলিম তোষণের জন্য আদিবাসীরা এই দীর্ঘ অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছে না।

টিএমসি নেতা ইদ্রিশ আলি ইসলামবিরোধী মুশরিক ও মুরতাদ ঘোষিত হলেন

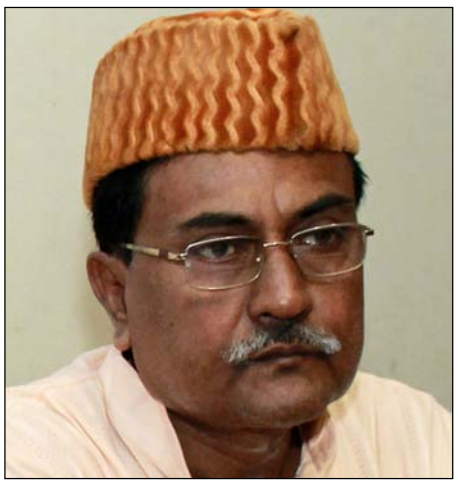

এই সেই ইদ্রিশ আলি যিনি ২০০৯ সালে ২১ নভেম্বর কলকাতায় তাণ্ডব করেছিলেন তসলিমা নাসরিনকে বিতাড়নের দাবীতে। কারণ—তসলিমা ইসলাম বিরোধী লেখা লিখেছেন বলে। সেদিন তিনি ছিলেন কংগ্রেস নেতা। তবু পুরো ইসলাম সমাজ সেদিন ইদ্রিস আলির পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল কারণ তিনি ইসলাম বিরোধী তসলিমার বিরুদ্ধে দেশত্যাগের ফতোয়া জারি করেছিলেন। আজ তিনি তৃণমূল কংগ্রেস নেতা এবং বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে টিএমসি প্রার্থী। ইসলামের এই রক্ষককে গত ৯ এপ্রিল ইসলামের চরম শত্রু মুশারিক ও মুরতাদ হিসাবে ঘোষণা করল পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলায় অবস্থিত বিখ্যাত আল-নাক্সবান্দিয়া মসজিদ-এর হোরপুর সায়েদিয়া দরবার শরীফ। তাঁর অপরাধ—তিনি গত ৩ এপ্রিল তারিখে হিন্দুদের লোকনাথ মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে চরম ইসলাম বিরোধী কাজ করেছেন।

যেসব রাজনৈতিক হিন্দু নেতারা ইসলামিক টুপি পরে বা হিজাব টেনে আর ইফতার খেয়ে মুসলিম ভোট পাওয়ার জন্য নিজের হিন্দু ধর্মকে ক্রমাগত অপমান করছেন, তাঁরা কি এ ঘটনা থেকে একটুও শিক্ষা নেবেন?

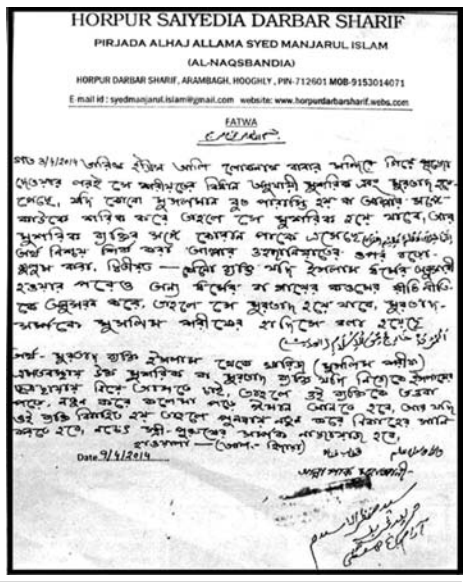

HORPUR SAIYEDIA DARBAR SHARIF
PIRJADA ALHAJ ALLAMA SYED MANJARUL ISLAM
(AL-NAQSBANDIA)
HORPUR DARBAR SHARIF, ARAMBAGH, HOOGHLY, PIN-712601 MOB-9153014071
E mail id : syedmanjarul.islam@gmail.com website: www.horpurdarbarsharif.webs.com
FATWA
Date 9/5/2014

জাতি ও বর্ণভেদ আর কতদিন ?

শূদ্রের অবস্থান ও অবস্থা ঃ বাস্তব চিত্র

শেষ পর্ব

তপন কুমার ঘোষ

এইবার লেখার সবথেকে কঠিন পর্যায়ে পৌঁছেছি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নিয়ে লেখার পর শূদ্র নিয়ে লিখতে হবে। না লিখতে হলেই সবথেকে ভালো হত। কারণ অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয় এটা। কিন্তু না লিখলে বৃত্তটাও সম্পূর্ণ হয় না, আর পলায়নী মনোভাবের পরিচয় ফুটে ওঠে। তাই সাহস করে লেখার চেষ্টা করছি।

প্রথমেই সমস্যা যেটা তা হল, শূদ্র নিয়ে লিখতে হলে শূদ্রের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। আর, শূদ্রের সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন, সমাজে প্রচলিত ধারণা—শূদ্র মানেই পিছে, বাকি তিন বর্ণের নিচে। তাই শূদ্র নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই আমার মতামত, ধারণা, ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন, পাঠকরা একথা ভেবে নিতে পারেন যে, আমি শূদ্রের নিম্নে অবস্থানকে মেনে নিয়েছি বা গ্রহণ করেছি। তাই এই লেখায় রিস্ক। অতএব আত্মরক্ষার একটা প্রচেষ্টা করতেই হয়। আমার আত্মরক্ষার বর্মটা হল এই ঃ সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থা ও শ্রেণীবিন্যাস আমি যতটা অনুধাবন করতে পেরেছি তাতে আমার জন্মগত বা পরিবারগত স্থান শূদ্র বর্ণে (If there is Varna at all in our present society which I always refused to accept.)।

আমি অনেকবার অনেক লেখায় বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে আমাদের দেশে, বিশেষ করে উত্তর ভারতে জাত আর বর্ণ জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গিয়েছে। জাত প্রায়শই বৃত্তিভিত্তিক। ছুতার, কামার, সদগোপ, তাঁতি, তেলি, তিলি প্রভৃতি জাতকে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। যেসব ক্ষেত্রে বৃত্তি ও জাত অঙ্গাঙ্গী নয়, সেসব ক্ষেত্রেও জাত স্পষ্টভাবে চিহ্নিত। যেমন, মাহিষ্য, কায়স্থ, বাগদী, নমঃশূদ্র, আগুড়ি ইত্যাদি। হিন্দি বলয়েও ভূমিহার, কুর্মি, যাদব, খটিক, বাল্মীকি প্রভৃতি জাতি পরিচয় প্রত্যেক হিন্দুর জন্যই নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু অনেকেরই বর্ণের পরিচয় বড়ই গোলমেলে। এইসব গোলমালের মধ্যেও যেটুকু ধারণা নিয়ে আমাদের সমাজটা চলছে, সেই ধারণা অনুসাারে কায়স্থরা শূদ্র বর্ণের মধ্যে পড়ে। চাঁদের মধ্যেও যেমন কালো দাগ আছে, তেমনি স্বামী বিবেকানন্দের একনিষ্ঠ ভক্ত ও অনুগামী হয়েও স্বামীজীর মধ্যে এই একটি মাত্র কালো দাগ আমি দেখতে পেয়েছি। তা হচ্ছে, স্বামীজী আমেরিকায় বসে প্রায় চোখের জল ফেলতে ফেলতে নিজের শূদ্র পরিচয় অস্বীকার করেছেন ও নিজেকে (কায়স্থ বলে) ক্ষত্রিয় পরিচয় দিয়েছেন এক অতি অতি দুঃসহ অবস্থায় পড়ে। যে ঘটনার বর্ণনায় যাচ্ছি না। আগ্রহী পাঠক পড়ে নেবেন। কিন্তু স্বামীজীর এই নিজেকে ক্ষত্রিয় বলা ও শূদ্র পরিচয় অস্বীকার করা—এটাকেই আমার কাছে স্বামীজীর উজ্জ্বল জীবনে একমাত্র কালো দাগ বলে মনে হয়েছে। আবার স্বামীজীর কথাতেই 'লোকাচার, দেশাচার খুবই শক্তিশালী'। তাই তিনি বললেও কায়স্থরা ক্ষত্রিয় বর্ণ—এটা সমাজে সর্বজনস্বীকৃত নয়। কায়স্থর মত বদ্যিদেরও বেশ একটু উন্নত জাত বলে মনে করা হয়। কিন্তু আমাদের বাংলার ধর্মজগতে খুবই শ্রদ্ধেয় একজন ধর্মগুরু ঠাকুর শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথকে আমি দেখেছি যে, তাঁর কায়স্থ, বদ্যিসহ সকল অব্রাহ্মণ শিষ্যকে (তাদেরকে তিনি খুবই স্নেহ করতেন) দিয়ে সঙ্কল্প করাতেন যে মা-বাবার মৃত্যুতে ৩০ দিনের অশৌচ পালন করবে এবং নিজ সন্তানদের অসবর্ণে বিবাহ দেবে না। পুরোহিত—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা ভদ্রতাবশতঃ মুখে বলেন না যে অব্রাহ্মণরা সকলেই শূদ্র (সারা দেশে নয়, আমাদের এই বাংলায়)। কিন্তু তাঁরা যেসব বিধিনিয়ম পালন করেন ও যজমানদের দিয়ে করান, তা সামান্য খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। আমি নিজে গভীর বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ধর্মকর্মে সঙ্কল্পের সময় পুরোহিতরা সমস্ত অব্রাহ্মণ যজমানদের তাদের উপাধি যা-ই হোক না কেন, নামের সঙ্গে ও তাদের পিতামাতার নামের সঙ্গে দাস ও দাসী শব্দ ব্যবহার করান এবং ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে দেব ও দেবী শব্দ ব্যবহার করান। এটা আমার কাছে খুবই আপত্তিজনক এবং অপমানজনক মনে হয়েছে। অব্রাহ্মণ ও শূদ্ররা দাস হলে কার দাস? যদি বলেন ভগবানের দাস, তাহলে আপত্তি নেই। কিন্তু সেক্ষেত্রে ব্রাহ্মণরা বা অন্য বর্ণরা, তারা দাস হবে না কেন? তাহলে তো এই সত্যটাই বেরিয়ে আসছে যে আমাদের প্রচলিত শাস্ত্রে ও মন্ত্রে শূদ্রদেরকে অন্য তিন বর্ণের দাস বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। সুতরাং যুক্তি, ব্যাখ্যা, শাস্ত্রের বাছাই করা শ্লোক দিয়ে যতই প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা করা হোক না কেন যে সমাজের প্রত্যেক জাতির জন্য কর্ম বা বৃত্তি নির্দিষ্ট করা আছে এবং প্রত্যেক কর্ম এবং প্রত্যেক বৃত্তিই সমান গুরুত্বপূর্ণ, তা দিয়েও এই তিক্ত দাস ও প্রভুর (দাস থাকলেই প্রভু থাকবে) ধারণাকে চাপা দেওয়া যাবে না। সুতরাং সত্যটাকে স্বীকার করে নিয়ে বর্তমানে সেটাকে অচল ঘোষণা করাই ঠিক নয় কি?

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ
সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্চতে।
বেদপাঠী ভবেৎ বিপ্রঃ
ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ।"

এই সত্যকে স্পষ্ট অনুভব করে স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং তার সংশোধন করতে চেয়েছিলেন বলেই কর্মবীর স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করে শূদ্রের জন্য নিষিদ্ধ গায়ত্রীমন্ত্র সর্বজনে ব্যাপক প্রচার করেছিলেন যা আজও গোটা উত্তরভারতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এর মধ্য দিয়ে সত্যকে স্বীকার করা ও সংশোধনের এক সৎ প্রয়াস দেখা যায়।

শাস্ত্রে আছে—

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ
সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্চতে।
বেদপাঠী ভবেৎ বিপ্রঃ
ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ। (আত্রেয় স্মৃতি, ১৪১-১৪২ শ্লোক)

অর্থ ঃ—শূদ্ররূপেই সবাই জন্মগ্রহণ করে, বিধিবদ্ধ সংস্কারের দ্বারা হয় দ্বিজ (তিন বর্ণ যারা উপবীত ধারণ করে), বেদপাঠী হলে হয় বিপ্র এবং ব্রহ্মকে জানলে তবেই হয় ব্রাহ্মণ। সুতরাং শূদ্র জন্ম কোন খারাপ ব্যাপার নয় বা অপমানের নয়।

আবার শাস্ত্রে একটা বহুচর্চিত শ্লোক আছে যাতে বলা হয়েছে ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উদর থেকে বৈশ্য ও পা থেকে শূদ্রের সৃষ্টি। সুতরাং ব্রাহ্মণ সব থেকে উঁচুতে, শূদ্র সব থেকে নিচে, আর মাঝখানে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। এইভাবে দেখলে শূদ্রকে ছোট করা হয়। সুতরাং সেই ভাবনা বা ধারণা কাটানোর জন্য বহু চেষ্টা, বহু ব্যাখ্যা করা হয়। পা না থাকলে শরীর চলতে পারে না। তাই শূদ্রই সমাজকে চালাচ্ছে। আমরা গুরুজনদের বা দেবমূর্তিকে যখন প্রণাম করি তখন তার মাথায় করি না, পায়ে প্রণাম করি। সুতরাং পা মাথার থেকেও বেশি সম্মানের, ইত্যদি বহু রকমের ব্যাখ্যা। কিন্তু ব্যাখ্যায় ডাল গলে না। সমাজেও ধারণার পরিবর্তন হয় না। উঁচু-নিচু ভাব, ভেদাভেদ কাটে না। তাই উত্তর ভারতে যখন সমাজের একটা বিশাল অংশকে দলিত বলে চিহ্নিত করা হয় তখন কেউ জোর গলায় বলতে পারবেন না যে এই 'দলিত' নামটা অনুচিত ও অপ্রাসঙ্গিক, এরা সামাজিক দলন, নিপীড়ন, বৈষম্য-লাঞ্ছনার শিকার হয় নি। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে যতই তুমি পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম কর না কেন, সমাজের সেই পূজ্য 'পা' সমাজের লাথিই খেয়েছে। তাই তো তারা আজ দলিত নামে পরিচিত বা স্বীকৃত। আজ তারা যখন নিজেদেরকে জোটবদ্ধ করে মাথায় 'বহেনজী'কে (মায়াবতী) বসিয়েছে, তখন তা সকলেরই মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের নামে এখন আমরা অভিযোগ করছি যে ওরা জাতপাতের রাজনীতি করছে। অভিযোগটা কি ঠিক? আমার মতে, না। জাত থাকবে, একটা জাত চিরকাল পিছনে পড়ে থাকবে, নিপীড়িত, পদদলিত হবে, শাস্ত্রে ও মন্ত্রে দাস বলে উল্লেখিত হবে, এসবে দোষ নেই, আর তারা একজোট হয়ে মানুষের মত, অন্যদের সমান সম্মান পেতে চাইবে—তাতেই দোষ? রাজনৈতিক স্বার্থে চাকরি, শিক্ষা ও বহু ক্ষেত্রে সংরক্ষণ সমাজে স্বার্থের হানাহানি শুরু করেছে। উচ্চ বর্ণকে (তিন বর্ণ) দলিতদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় খুব ভালো করে জানি, গভীরভাবে জানি যে, এই বিশাল দলিত সমাজের সার্বিক ঐকান্তিক চাহিদা, আকাঙ্খা সংরক্ষণ নয়, চাকরি নয়, শুধু আর শুধুই মনুষ্যত্বের সম্মান ও সামাজিক মর্যাদা। শহরের শিক্ষিত মানুষের এটা বুঝতে অসুবিধা হবে। কিন্তু সত্য সেটাই। মনে করুন একটি দশ হাজার সংখ্যার জনবসতিতে একটি মাত্র ছেলে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। সেখানে স্কুলে শিক্ষকতার চাকরির জন্য আশা করতে পারে ঐ একটি মাত্র ছেলে ও তার পরিবার। সংরক্ষণ থাকলে তার একটু সুবিধা হয়। কিন্তু বাকি ন'হাজার ন'শ নব্বই জন দলিত মানুষের তো তাকে কোন লাভ নেই! তাহলে তারা এত ক্ষুব্ধ কেন? কিসের টানে তারা ছুটে যাচ্ছে আম্বেদকর, রামস্বামী নাইকার, বহেন মায়াবতী, রামবিলাস পাসোয়ানদের দিকে। চাকরির আশায় নয়। মনুষ্যত্বের সম্মানটুকু পাওয়ার আশায়। একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলি ঃ বিহারের গোপালগঞ্জ জেলার একটি গ্রামে গেছি। সেখানে বাল্মীকি বা রবিদাস সম্প্রদায়ের জাতির অনেক মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশেছি। বয়স্কদের সঙ্গে এবং তরতাজা যুবকদের সঙ্গেও। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, তাদের চাহিদা চাকরি নয়, জমি নয়, শুধু গ্রামে ভূমিহারদের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরে প্রবেশাধিকারের। নিজেকে সামলাতে পারিনি। এরা মন্দিরে প্রবেশ করতে চাইছে। সমাজ ঢুকতে দিচ্ছে না। এরপর এরা যখন বিধর্মী হয়ে যাবে, ইসলাম গ্রহণ করবে, তখন এই হিন্দু সমাজই ত্রাহি ত্রাহি রব তুলবে। আমি ঐ ভূমিহারদের সঙ্গে তর্ক করেছি—এদেরকে মন্দিরে ঢুকতে দিচ্ছেন না কেন? তারা বাজে অজুহাত দিয়েছে—এরা নোংরা থাকে, এরা মৃত পশুর চামড়া ছাড়ায়, তাই এদেরকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। তাহলে মৃত পশুর চামড়া কে ছাড়াবে? আসলে এসব অজুহাত। উত্তরপ্রদেশের ঠাকুরদের (ক্ষত্রিয়) মধ্যে যান। দেখবেন তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনায় জননেত্রী মায়াবতীকে সবসময় চরম ঘৃণা ভরে 'চামরাইন' বলে উল্লেখ করে। মানে 'চামারনী'। সুতরাং তিনি মুখ্যমন্ত্রী হলেও সবর্ণের কাছে তাঁর চামার পরিচয়টাই মুখ্য এবং ঘৃণ্য।

সুতরাং শূদ্র বা দলিতদের প্রতি সমাজের বাকি অংশের মনোভাব পরিবর্তন করাটাই হচ্ছে আসল দরকারি কাজ। অন্য ব্যাখ্যা, যুক্তিতে কাজ হবে না। এই মনোভাব পরিবর্তন যদি আমরা না করতে পারি, তাহলে আমাদের বিপদ কেউ ঠেকাতে পারবে না। কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অবস্থা তার স্পষ্ট প্রমাণ। পূর্ববঙ্গেও হিন্দুদের এই দুরবস্থার পিছনে অনিবার্য কারণ জাতপাতের বিভেদ ও নমঃশূদ্রদের প্রতি ঘৃণার ভাব।

ভাবলে বুক ফেটে যায় যে, যারা নিজেদের উপাধি 'রাম' নিয়েছে, তারাই রামের মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে না। রামের স্রষ্টা 'বাল্মীকি'র নামে যারা নিজেদের উপাধি নিয়েছে তাদেরও ঐ একই অবস্থা। আমাদের এই পাপের মূল্য কি দিতে হবে না? একটু ভেবে দেখুন তো আমাদের সমাজের এইসব অংশগুলিকে, যাদেরকে মনুষ্যত্বের সম্মান দেওয়া হয়নি, মন্দিরে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়নি, এক পুকুরে (আম্বেদকর-চৌদার তালাও) বা এক কলে জল খেতে দেওয়া হয়নি, তারা যে আজও বিধর্মী হয়ে যায়নি, তার জন্য কতটুকু কৃতিত্ব আমাদের সমাজের উচ্চবর্ণ দাবী করতে পারে? আমার ধারণা—একটুও না। তাদেরকে আমাদের ধর্মে টিকিয়ে রাখার জন্য আমাদের সমাজ কী করেছে? কিছুই না। তারা যে আজও হিন্দু সমাজের মধ্যে সংযুক্ত আছে তার সবটুকু কৃতিত্ব/শ্রেয় তাদেরই প্রাপ্য, আর কারও নয়।

এখনও সাবধান হওয়ার সময় আছে, ভারতে ইসলাম ধনে, জনে ও প্রতিপত্তিতে যেরকম বাড়ছে তাতে এই সময় আর বেশিদিন থাকবে না। তার আগেই আমাদেরকে সুনিশ্চিত ও ফলদায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে—আমেরিকার মত। সেখানে বর্ণবৈষম্য দূর করার জন্য ছোটবেলা থেকেই প্রতি স্কুলে এ ব্যাপারে শিক্ষা দেওয়া হয়, যাতে ছোট থেকেই তারা সাদা ও কালোর মধ্যে ভেদ না করার শিক্ষা পায়। যে কাজটা কিন্তু অনেক কঠিন আমাদের থেকে। কারণ সাদা ও কালোদের মধ্যে চেহারায় বৈসাদৃশ্য প্রকট। সে তুলনায় আমাদের কাজটা সহজ। শুধু মন থেকে এটা গ্রহণ করতে হবে। আমাদের প্রতিটি স্কুলে প্রথম থেকেই শিক্ষা দিতে হবে যে জন্মের দ্বারা মানুষের স্তর নির্ধারণ হয় না, কর্মের দ্বারা হয়। কোন বিশেষ পরিবারে বা বিশেষ গোষ্ঠীতে জন্মের জন্য কেউ ছোট নয়, কেউ বড় নয়, সকলেই সমান। কর্মের দ্বারা, যোগ্যতার দ্বারা, আচরণের দ্বারা, ব্যবহারের দ্বারা প্রত্যেককে বড় হতে হবে। শুরু থেকেই শিশুদের মনে ছোট জাত, ছোটলোক ইত্যাদি কথাগুলো যেন একেবারেই স্থান না পায়। চামরাইন, চাঁড়াল, কাওড়া ইত্যাদি কোনরকম জাতিসূচক গালাগালি বা অবজ্ঞা ভাব যেন ছোটদের মনে বাসা বাঁধতে না পারে, তার জন্য শক্ত শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে। এই সমস্ত পদক্ষেপ ও ব্যবস্থার অন্তিম ফল হবে—শূদ্র, দলিত, হরিজন প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি।

(সমাপ্ত)

১৫০ বছরের পুরানো মন্দিরে তালা

উত্তপ্ত মালদা জেলার কালিয়াচক

মালদা জেলার কালিয়াচক থানার শেরশাহী গ্রামের ১৫০ বছরের পুরোনো শিব মন্দিরে তালা ঝুলিয়ে দিল জনৈক মান্নান শেখ। সূত্রের খবর অনুযায়ী প্রায় দেড় বিঘা জমি সহ এই মন্দিরটি দেবোত্তর সম্পত্তি। এই মন্দিরে প্রায় ১৫০ বছর ধরে নিত্য পূজা হয়ে আসছে। পূজা করার জন্য একজন পুরোহিতও এই মন্দিরে নিযুক্ত আছেন। গত ২৩শে এপ্রিল এই মন্দিরটি আচমকা তালা ঝুলিয়ে দেয় মান্নান শেখ। তার বক্তব্য জনৈক উজ্জ্বল চৌধুরী তাকে এই সম্পত্তি বিক্রি করেছে। যদিও দেবোত্তর সম্পত্তি আইনত বিক্রি করা যায় না। এলাকার সংখ্যালঘু হিন্দুরা এই ঘটনায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ এবং এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

গণধোলাইয়ে চোরের মৃত্যু, গ্রেপ্তার ছয় হিন্দু

গত ৮ই এপ্রিল ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার রামনগর থানার অন্তর্গত দক্ষিণ ভাদুরিয়া গ্রামে এক চোরকে পিটিয়ে মারার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল ছয়জনকে। স্থানীয় সূত্র অনুযায়ী ওই দিন রাত দু'টো নাগাদ জনৈক বিশ্বজিত মণ্ডলের মোবাইল ফোনের দোকানে তিনজন যুবক চুরি করতে এলে গ্রামবাসীরা টের পেয়ে তাদের ঘিরে ফেলে। শঙ্করপারুলিয়া গ্রামের সরিফুল সেখ (১৭ বছর) নামে একজন হাতেনাতে ধরা পড়লেও বাকি দুজন পালিয়ে যায়। পুলিশ এসে পৌঁছানোর আগেই গণধোলাইয়ে সরিফুলের মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যে শঙ্করপারুলিয়া গ্রামের তৃণমূল কংগ্রেস নেতা আবুসামাদ-এর নেতৃত্বে প্রায় পাঁচশ জন মুসলমান ঘটনাস্থলে জড়ো হয়ে দক্ষিণ ভাদুরিয়া গ্রাম আক্রমণ করার চেষ্টা করে। পুলিশ বাধা দিলে তারা ৭টি বাস এবং ৩টি পুলিশ গাড়ি ভাঙচুর করে এবং একটি পুলিশ গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। প্রশাসন র‍্যাফ নামিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এরপর আবুসামাদরা দোকান মালিক বিশ্বজিত মণ্ডল ও স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তুহিন সামন্তকে গ্রেপ্তারের দাবিতে প্রায় ৪ ঘণ্টা ফলতা রোড অবরোধ করে। পুলিশ তাদের দাবি মেনে ৯ এপ্রিল তুহিন সামন্ত, চিরঞ্জিত সামন্ত, রঞ্জিত সামন্ত এবং বিশ্বজিত মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে। পরে ভাঙচুরের অভিযোগে ৮ মুসলিম দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করা হলেও সন্ধ্যার সময় রাজনৈতিক চাপে পুলিশ তাদেরকে ছেড়ে দেয়। পরেরদিন দঃ ভাদুরিয়া গ্রাম থেকে আরও দুজন হিন্দু বিশ্বনাথ সামন্ত এবং বুদ্ধদেব সামন্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

সামান্য বচসার জের, বাড়ির ভিতরে ঢুকে মহিলাদের মারধোর করলো হামলাকারীরা

৭ই এপ্রিল সকাল সাতটা নাগাদ হাবড়া থানার বদর বাসস্ট্যান্ড-এর কছে কলাপোতা গ্রামের রঞ্জিত দে-র সঙ্গে দক্ষিণসারির গ্রামের নুর ইসলামের মধ্যে রাস্তা পার হওয়া নিয়ে প্রথমে কথা কাটাকাটি ও পরে হাতাহাতি হয়। পথচারীদের মধ্যস্থতায় ব্যাপরটা তখনকার মতো মিটে যায়। এরপর রঞ্জিত দে তার কলাপোতার বাড়িতে ফিরে আসেন। ঐদিন দুপুর ২টা নাগাদ নুর ইসলাম চারটে বাইকে করে এলাকার প্রায় ১০/১২ জন যুবককে সঙ্গে নিয়ে রঞ্জিত বসুর বাড়িতে চড়াও হয়। বাড়িতে তখন কোন পুরুষ মানুষ ছিল না। নুর ইসলামের দলবল রঞ্জিত দে-র বৌদি স্বাতী দে ও শিবাণী দে-কে প্রচণ্ড মারধোর করে। তাদের হাতের শাঁখা ভেঙে দেয়। বাড়িতেও ভাঙচুর চালায় হামলাকারীরা। আক্রান্ত মহিলাদের চেঁচামেচিতে পাড়ার লোকজন ও রঞ্জিত বাবুর ভাইরা বাইরে থেকে ছুটে আসে। বিপদে পড়ে দুষ্কৃতিরা পালাবার চেষ্টা করলেও তাদের মধ্যে তিনজন ধরা পড়ে যায়। তাদের আটক করে এলাকাবাসীরা দেগঙ্গা থানায় খবর দেয়। এদিকে পুলিশ আসার আগেই কলাপোতা গ্রামের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য ঘটনাস্থলে এসে ব্যাপারটা মিটমাট করে নেওয়ার জন্য চাপ দেয় এবং নুর

ইসলামসহ তিনজনকে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। যে তিনটি বাইক আটক করা হয়েছিল, পুলিশ এসে সেগুলি দেগঙ্গা থানায় নিয়ে যায়।

বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে গত ৮ এপ্রিল হিন্দু সংহতির অন্যতম সদস্য সুষেণ বিশ্বাসের নেতৃত্বে একটি দল রঞ্জিত দে-র বাড়িতে যান এবং আঘাতপ্রাপ্ত মহিলাদের উপর অত্যাচারের বর্ণনা শোনেন। এই পাশবিক ঘটনার বিবরণ শুনে বিষয়টি প্রশাসনের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছানোর এবং দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে রঞ্জিত বাবুদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন।

হিন্দু সংহতির কর্মীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা হল বজরংবলি মন্দির

দঃ ২৪ পরগণার জয়নগরে হিন্দু সংহতির কর্মীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হল বজরংবলি মন্দির। গত ১লা এপ্রিল দুর্গাপুরের তালতলার মোড়ে মহা সমারোহে নাম সংকীর্তন এবং প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই দিন মন্দির উদ্বোধনের সময় স্থানীয় কিছু মুসলিম দুষ্কৃতিদের বাধা উপেক্ষা করে, সংহতির স্থানীয় কর্মকর্তা ধনঞ্জয় ঘোষ এবং মানু হাইত ও অন্যান্যদের নেতৃত্বে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়।

মালদার সিহিপুরে দুষ্কৃতিদের তাণ্ডব ব্যাপক মারধর ও হিন্দু মহিলাদের শ্লীলতাহানি

গত ৩১শে মার্চ মালদা জেলার তপশিলি সম্প্রদায় অধ্যুষিত সিহিপুর গ্রামে রীতিমতো তাণ্ডব চালাল সুজাগঞ্জ এবং কুশিয়ালবাড়ি রানীগঞ্জের মুসলমান দুষ্কৃতিরা। মূলতঃ 'হাড়ি' সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস এই সিহিপুর গ্রামে। গত ৩০শে মার্চ রাত্রি প্রায় ২-৩০ নাগাদ সুশীল দাসের গোয়াল থেকে গরু চুরি করার সময় হাতেনাতে ধরা পরে কুখ্যাত চোর 'বোবা'। এই বোবার দাদা জাকির হোসেন কংগ্রেসের নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য।

ওই রাতে সুশীল দাসের চিৎকারে গ্রামের লোকেরা সেখানে জড়ো হয়। তারা সেই গরুচোরকে পরদিন সকালে থানায় নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে একটি খুঁটিতে বেঁধে রাখে। খবর পেয়ে সকালে জাকির দলবল নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। সে বিকালে সালিশী সভার মাধ্যমে বিষয়টির সমাধান করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভাই বোবাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। সিহিপুরবাসীরা সরল বিশ্বাসে বিকাল বেলা সভাস্থলে উপস্থিত হয়। জাকির প্রচুর সংখ্যক মুসলমানদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে হাজির হয়ে বিচারের পরিবর্তে সিহিপুরের হিন্দুদের উপর মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রসহ ঝাঁপিয়ে পড়ে। হতচকিত হিন্দুরা এই আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ হয়। বিনা বাধায় মুসলমান দুষ্কৃতিরা সিহিপুরের বাড়ি বাড়ি ঢুকে লুটপাট ও মারধোর চালায়। মহিলাদের শরীর থেকে গয়নাগাটি ছিনতাই করে তাদের শ্লীলতাহানি করা হয়। পরিস্থিতি শান্ত হলে গুরুতর আহত অবস্থায় ৪০-৪৫ জন হিন্দুকে চাঁচল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। থানায় ১০ জন দুষ্কৃতির নাম সহ লিখিত অভিযোগ করতে গেলে পুলিশ তা নিতে অস্বীকার করে। পরে চাঁচল থানায় একটি জেনারেল ডায়েরি করা হয়েছে।

১ম পাতার শেষাংশ

আটেশ্বরতলায় রামনবমী উপলক্ষে বিরাট হিন্দু সম্মেলন

বিনাশের উদ্দেশ্যে লড়াই করেছিলেন। একইরকম শ্রীকৃষ্ণ ছেলেবেলায় পূতনা বধ থেকে শুরু করে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ পর্যন্ত অধর্মের নাশ করে ধর্মস্থাপনের উদ্দেশ্যে লড়াই করেছিলেন। যদি বাস্তবে কোন ব্যক্তির এঁদের প্রতি সামান্যতম ভক্তি থাকে, তাহলে তার উচিৎ এঁদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা। মঠ-মন্দিরে বসে নাম-জপ করলে ভগবানকে পাওয়া যাবে না।

হনুমান এবং অর্জুনের মত শ্রেষ্ঠ ভক্তদের ভগবান নিজেই খুঁজে নিয়েছিলেন, শরণ দিয়েছিলেন। কারণ এই ভক্তরা বলশালী ছিলেন, শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ছিলেন, প্রভূত পরাক্রমশালী ছিলেন, এখন যারা আমাদের চোখের জল ফেলা ভক্তির পথ দেখান, তাদের দেখানো এই পৌরুষহীন পথে ভগবানকে কোনদিন পাওয়া যায় নি, যাবেও না। শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ প্রদর্শিত লড়াইয়ের পথ অনুসরণ করে বর্তমানের রাক্ষসরূপী দুষ্কৃতিদের দমন করার শপথ নেওয়ার জন্য তিনি উপস্থিত হিন্দু সমাজকে আহ্বান করেন। অন্যদিকে সংহতির সহ সভাপতি শ্রী বিকর্ণ নস্কর হাওড়া জেলার বাগনান, কালিকাপুর (নিউ তরুণ সংঘ), কুলগাছিয়া (সারথী সংঘ) প্রভৃতি স্থানে রামনবমী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। কালিকাপুরের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, আমাদের সংস্কৃতিতে কর্তব্য পালনের নামই ধর্ম। শ্রীরামচন্দ্র তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজের কর্তব্য পালনের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন। অশুভ শক্তির বিনাশের জন্য শ্রীরাম প্রদর্শিত পদ অনুসরণ করার জন্য তিনি যুবসমাজকে আহ্বান করেন। এই ভ্রমণে শ্রী নস্করের সাথে ছিলেন সংহতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্রী চিত্তরঞ্জন দে।

লাভ জেহাদের শিকার প্রিয়াকে উদ্ধার করল সংহতির কর্মীরা

লাভ জেহাদের শিকার ১৪ বছরের প্রিয়া মণ্ডল (নাম পরিবর্তিত) অবশেষে উদ্ধার হল হিন্দু সংহতির কর্মীদের তৎপরতায়। ঘটনা দঃ ২৪ পরগণার মন্দিরবাজার থানার দঃ বিষ্ণুপুরের। গত ১৩ এপ্রিল নাবালিকা প্রিয়া মণ্ডল নিজের বাড়ির সামনে থেকে অপহৃত হয়। অপহরণকারী সাগির সেখ সেই এলাকায় এক গ্যারাজ কর্মী। তার বাড়ি রায়দিঘি থানার গিলেরছাট গ্রামে। প্রিয়ার বাড়ি থেকে মন্দির বাজার থানায় অপহরণের খবর জানানো হয় ১৪ এপ্রিল। প্রিয়ার অভিভাবকরা পুলিশের পাশাপাশি স্থানীয় হিন্দু সংহতির কর্মীদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেন। সংহতির কর্মীদের অক্লান্ত প্রয়াসে গতকাল সাগির সেখ তাদের হাতে ধরা পরে যায়। সংহতিকর্মীদের চাপে সাগির অপহৃত প্রিয়ার ঠিকানা বলতে বাধ্য হয়। অবশেষে ঢাকি রোড থেকে প্রিয়াকে উদ্ধার করে তারা পুলিশে খবর দেয়। ডায়মন্ডহারবার আদালতে পেশ করা হলে মেয়েটি বিবৃতি দেয় যে তাকে জোর করে অপহরণ করা হয়েছে। মহামান্য আদালত প্রিয়াকে তার অভিভাবকদের সাথে নিজের বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি দেয়। গণধোলাইয়ে আহত সাগিরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। যোগাযোগ করা হলে হিন্দু সংহতির স্থানীয় কর্মকর্তা রাজকুমার সরদার বলেন, এলাকায় এই ধরনের অসংখ্য ঘটনা ঘটে চলেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণ প্রেম-সংক্রান্ত ঘটনা বলে উপেক্ষা করা হলেও বিষয়টি সুপরিকল্পিতভাবে হিন্দুদের আতঙ্কিত করার চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি আরও বলেন যে হিন্দু সংহতির প্রয়াসে হিন্দুদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ছে এবং তারা সমাজের উপর আগত যে কোন আঘাতের যোগ্য জবাব দিতে প্রস্তুত।

একমাত্র সংবেদনশীল এবং প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দুত্বই আমাদের বাঁচাতে পারে

হিন্দু সমাজের সংবেদনশীলতা আজ তলানিতে ঠেকেছে। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ—দুইভাবেই যথেচ্ছ আক্রমণ চলছে হিন্দুর উপর, অথচ হিন্দু নির্বিকার, কোন প্রতিক্রিয়া চোখে পড়ছে না, বিশেষতঃ আমাদের এই বাংলায়। একদিকে চলছে বাম বুদ্ধিজীবিদের তাত্ত্বিক আক্রমণ। অপরদিকে চলছে হিন্দুর উপর প্রত্যক্ষ আক্রমণ। আমরা চোখে দেখেও দেখছি না। কানে শুনেও শুনছি না। ধর্মনিরপেক্ষতার পর্দা আমাদের চোখ ও কান—দুটোকেই বন্ধ করে দিয়েছে। তথাকথিত বুদ্ধিজীবিদের কলম এবং মুখের দাপটে আমাদের সর্বজনীন, উদার হিন্দু মূল্যবোধগুলি আজ আমাদের প্রগতিশীল বাঙালির কাছে সংকীর্ণতা এবং ধর্মান্ধতা হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। হিন্দু পরিচয় আজ আমাদের কাছে গৌরবের বিষয় নয়। এই স্রোতে গা ভাসানোর প্রবণতা ভাইরাসের মত ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। সাধু-সন্ন্যাসীরাও ব্যতিক্রম নন। সারা বিশ্বে হিন্দুত্বের পতাকা উড্ডীন করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। চিকাগো ভাষণের ছত্রে ছত্রে হিন্দুত্বের বিশ্বজনীনতার কথা তুলে ধরেছিলেন তিনি এবং স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন যে, এই হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি গর্ব অনুভব করেন। অথচ তাঁর ধ্বজাধারী রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ণধাররা আজ নিজেদের হিন্দু পরিচয় অস্বীকার করতে তৎপর, এমনকি খোদ স্বামীজিকেই তারা এই তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার মোড়কে মুড়ে আমাদের সামনে তুলে ধরতে বদ্ধপরিকর।

হিন্দু মানেই সে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ—এই সহজ সরল সত্যটা কেউ অস্বীকার করতে পারে কি? অন্য ধর্মীদের হাতে এত অন্যায়, এত অত্যচার সহ্য করার পরেও ভারতবর্ষ যে আজও ধর্মনিরপেক্ষ, সংখ্যালঘুরা সারা পৃথিবীর তুলনায় এদেশে বেশি সুরক্ষিত—তার কারণ এদেশের সংবিধান বা সরকার তাদের সুরক্ষা দিচ্ছে বলে নয়। তার একমাত্র কারণ এই, যে ভারতবর্ষ এখনও হিন্দুপ্রধান। এদেশে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার গ্যারান্টি কোনও রাজনৈতিক দল, সরকার বা প্রশাসন নয়—দিতে পারে একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজ। তা না হলে আজ হিন্দুবিহীন কাশ্মীর ধর্মনিরপেক্ষ নয় কেন? কেন ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ নয়? শুধু কাশ্মীর কেন, যেখানে যেখানে হিন্দু সংখ্যালঘু হয়ে গেছে, সেই সেই অংশে ধর্মনিরপেক্ষতা হয়েছে পদদলিত। তার সাথে সাথে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জেহাদী সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ। এই কঠোর সত্য স্বীকার করার সময় কি এখনও আসেনি? অথচ এই হিন্দুকেই ধর্মনিরপেক্ষতার পাঠ পড়ানো হচ্ছে। এই মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার মাদকে আচ্ছন্ন করে হিন্দু সমাজকে হীনবল করে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে হিন্দুকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দায়িত্বের বোঝা একা তার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে। হিন্দুর স্বার্থ রক্ষার জন্য আওয়াজ উঠলেই সাম্প্রদায়িকতার তকমা এঁটে তাকে দমন করা হচ্ছে কঠোরভাবে। পাশাপাশি হিন্দুর উপর চলছে প্রত্যক্ষ আক্রমণ। নিঃশব্দে চলছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি। ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকির মতে আজ পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যা এরাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৪১ শতাংশেরও বেশি। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুর সংখ্যালঘু হতে আর কত সময় লাগবে? সেদিন আর দূরে নয় যেদিন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে কোন বন্দ্যোপাধ্যায়-চট্টোপাধ্যায় থাকবে না, থাকবে শুধু মোল্লা বা ইসলাম পদবীধারী ব্যক্তিরা। সেদিন এই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা শান্তি ও সুরক্ষার সাথে এখানে বসবাস করতে পারবেন তো? একদিন বাংলাদেশ থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে যেভাবে পালিয়ে আসতে হয়েছিল, ঠিক সেভাবে এই বাংলা ছেড়ে পালাতে হবে না তো? দুই ২৪ পরগণা, হাওড়া, নদীয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর সহ বাংলার যে যে জেলায় হিন্দুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে, সেখানে রাজনৈতিক সংঘর্ষ, ডাকাতি ইত্যাদি বিভিন্ন অছিলায় হিন্দুর উপর চলছে অবর্ণনীয় অত্যাচার। জমি দখল, ঘরবাড়ি লুঠ, পুড়িয়ে দেওয়া, ফসল ও মাছের ভেড়ি লুঠ থেকে শুরু করে হিন্দু নারীধর্ষণ, হত্যা ও অপহরণ—সব কিছুই চলছে অবাধে। এসবের আসল উদ্দেশ্য গ্রামের পর গ্রাম হিন্দুবিহীন করে দেওয়া। এখনই সচেতন না হলে কি আবার দেশভাগ, আবার উদ্বাস্তু হওয়া, আবার নারকীয় হত্যালীলা, মা বোনের সম্ভ্রমহানি আটকানো যাবে?

বাংলার জন-চরিত্রের পরিবর্তনের সাথে সাথে বদলাচ্ছে এরাজ্যের চালচিত্র। ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, বিনয়-বাদল-দীনেশের বিপ্লবী বাংলা এখন জেহাদী সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর— রশিদ খান, আফতাব আনসারি, ইয়াসিন ভাটকালদের লীলাক্ষেত্র। এন.আই.এ. এবং আই.বি.-র বক্তব্য অনুসারে বাংলাদেশ থেকে তাড়া খাওয়া বেশ কিছু সন্ত্রাসবাদী পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে। এই সন্ত্রাসবাদীদের পিছনে মদত আছে এরাজ্যের সরকারি পার্টির কয়েকজন নেতার। এই সমস্ত নেতারা আবার লোকসভা এবং রাজ্যসভার এম.পি.। তবুও বাংলার হিন্দু নির্বিকার। আমাদের এই উদাসীনতার মূল্য দিতে হবে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে। আর সেই মূল্য হবে ভয়ঙ্কর। আমাদের পূর্বপুরুষদের উদাসীনতার মূল্য দিয়েছি আমরা। তবুও ওপার থেকে অপমানজনকভাবে বিতাড়িত হয়ে এসে এই বাংলায় আমাদের ঠাঁই হয়েছিল। কাশ্মীরের হিন্দুর মত এই বাংলা থেকে বিতাড়িত হয়ে আমাদের ছেলেমেয়েরা কোথায় যাবে? তাদের ভবিষ্যৎ কী হবে? তারা কি আমাদের কাছে জবাব চাইবে না? তাই সময় থাকতে সচেতন হতে হবে, সংবেদনশীল হতে হবে। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে কোন একজন হিন্দুর উপর অত্যাচার হলে প্রত্যেকটি হিন্দু যেদিন ক্রোধে পাগল হয়ে উঠবে এবং প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত, শান্ত হবে না—সেদিন থেকে হিন্দুর ভাগ্যের চাকা ঘুরতে শুরু করবে। এইরকম সংবেদনশীল এবং প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দুত্বই হিন্দু সমাজকে রক্ষা করতে পারবে, আমাদের দেশ এই সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

হিন্দু সংহতির সংস্পর্শে মাথা তুলছে দেগঙ্গার হিন্দুরা

সালটা ২০১০। দাউ দাউ করে জ্বলছে দেগঙ্গার ৮টি গ্রামে হিন্দুদের ঘরবাড়ি, লুট হচ্ছে হিন্দু ব্যবসায়ীদের দোকানপাট। ভাঙা হচ্ছে মন্দির। প্রকাশ্যে শ্লীলতাহানি হচ্ছে হিন্দু মা-বোনেদের। প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই হিন্দুদের। মাথা নিচু করে হজম করা ছাড়া আর একটা উপায় ছিল দেগঙ্গার হিন্দুদের সামনে—নরেন মল্লিকের পথ। ১৫ বিঘার বাড়ি জমি কুখ্যাত দুষ্কৃতি আব্দুল মান্নানকে বিক্রি করে পালিয়ে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় চলে এলেন ভাসিলিয়া কলোনীর নরেন মল্লিক। নরেন মল্লিক শুধু উদাহরণ। এলাকার বহু হিন্দু এর আগে এবং পরে এভাবেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে বাঁচার রাস্তা নিয়েছেন এই আব্দুল মান্নানদের অত্যাচারে।

চিত্রটা এই চার বছরে কিছুটা পাল্টে গেছে। মানসিকতা পরিবর্তন হয়েছে হিন্দুদের। গত ৬ই এপ্রিলের এই ঘটনাতো সে কথাই বলছে। ভাসিলিয়া কলোনীর বাসিন্দা রবিন সাধুখাঁর বাড়ির সজনে গাছটা কেটে নিয়ে যাচ্ছিল আব্দুল মান্নান। রবিন সাধুখাঁর মা ও স্ত্রী রুখে দাঁড়ালেন এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে। ক্রোধে অগ্নিশর্মা মান্নান হাতের দা দিয়ে কোপ বসালো রবিনের বৃদ্ধা মায়ের উপর। প্রতিবাদ করায় কোপ পড়ল রবিনের মাথায়। রক্তাক্ত রবিন সাধুখাঁ ও তার মা'কে হাসপাতালে নিয়ে গেল প্রতিবেশীরা। এতদূর ঘটনাটা পরিচিত। এতদিন এটাই তো হয়ে এসেছে এবং গল্পটা এখানেই শেষ

২০১০ সালে দেগঙ্গার মন্দিরে ভাঙা কালীমূর্তি। (ফাইল চিত্র)

হয়ে গেছে। এবার কিন্তু গল্পটা শেষ হল না। হিন্দু সংহতির স্থানীয় কর্মীরা খবর পেয়ে ছুটে এল ভাসিলিয়া কলোনীতে। এলাকার লোকদের সঙ্গে নিয়ে ধরে আনল কুখ্যাত দুষ্কৃতি আব্দুল মান্নানকে। শুরু হল গণধোলাই। শেষে তাকে তুলে দেওয়া হল দেগঙ্গা থানার পুলিশের হাতে। রবিন সাধুখাঁর পক্ষ থেকে এফ.আই.আর. (১৯৪/১৪, তাং ৬-৪-২০১৪) করা হল মান্নানের বিরুদ্ধে।

হিন্দু সংহতির সহসভাপতি অ্যাডভোকেট ব্রজেন্দ্রনাথ রায় এবং সংহতির অন্যতম সক্রিয় সদস্য শ্রী সুষেন বিশ্বাস ভাসিলিয়া কলোনীতে গিয়ে রবিন সাধুখাঁ সহ স্থানীয় লোকদের সাথে দেখা করেন। সংহতির নেতৃত্বে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়া সাধারণ হিন্দুরা আব্দুল মান্নানের সমস্ত অত্যাচারের প্রতিকার দাবী করে দেগঙ্গা থানায় গণস্বাক্ষর সম্বলিত একটি প্রতিবাদপত্র দাখিল করেছেন।

ডাকাতি করার পর নাবালিকা স্কুল ছাত্রীকে গণধর্ষণ

এক আদিবাসী ধান ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতি করতে এসে তার ১৫ বছর বয়সী একমাত্র কন্যা রত্নাকে (নাম পরিবর্তিত) ছয়জন মিলে ধর্ষণ করলো ওসমান মোল্লা ও তার দলবল। গত ২৮ এপ্রিল রাত ২-০০টা নাগাদ সন্দেশখালি থানার ঝুপখালি কাছাড়িপাড়ার বাসিন্দা এই ব্যবসায়ীর বাড়ির দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়ে এই ডাকাতের দল। প্রত্যেকের হাতে ছিল মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র। এই ব্যবসায়ী যে সেদিন ধান বিক্রি করে ৭০ হাজার টাকা পেয়েছিলেন, সেই খবর তাদের কাছে ছিল। বাড়িতে ঢুকে তারা ওই টাকা দাবি করে। মহাজনের টাকা মিটিয়ে যে নগদ ২০ হাজার টাকা ঘরে এনেছিলেন, ওই ব্যবসায়ী সেই টাকা ডাকতদের হাতে তুলে দেন। কিন্তু তারা আরও ৫০ হাজার টাকার দাবি করে তাদের প্রচণ্ড মারধোর শুরু করে। জলের দুটি পাম্প মেশিন এবং ঘরের আলমারি ভেঙে প্রায় চার ভরি সোনার অলঙ্কারসহ মূল্যবান জিনিসপত্র তারা লুটপাট করে।

ওই ব্যবসায়ী এবং তার স্ত্রীর হাত-পা বেঁধে তাদেরএকমাত্র মেয়ে রত্নাকে সঙ্গে নিয়ে ওসমানের দল ঘর থেকে বেরিয়ে যায় এবং বাইরের দিক থেকে দরজা লাগিয়ে চলে যায়। যাওয়ার সময় তারা বলে যায় বাকি ৫০ হাজার টাকা দিয়ে মেয়েকে ছাড়িয়ে নিতে। আতঙ্কে মেয়েটির বাবা-মা বেশ কিছু সময় চুপ থাকার পর বাইরে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে চিৎকার শুরু করলে তাদের সেই চিৎকার শুনে আশপাশের মানুষ বেরিয়ে আসে। সবাই মিলে খোঁজাখুঁজি শুরু করলে নিকটবর্তী একটি খড়ের গাদায় রত্নাকে অচৈতন্য এবং সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় পাওয়া যায়। স্থানীয় খুলনা হাসপাতালে চিকিৎসার পরে তাকে বসিরহাট হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। রত্নার বয়ান অনুসারে যে ছয়জন মিলে ধর্ষণ করেছে, তাদের মধ্যে একজনকে সে চিনতে পেরেছে।

সূত্রের খবর অনুসারে ৩০ এপ্রিল সকাল পর্যন্ত পুলিশ ওসমান মোল্লাকে গ্রেপ্তার করেছে। এই ওসমান তৃণমূল কংগ্রেস-এর সক্রিয় কর্মী এবং আগারাটি সরবেড়িয়া অঞ্চলের উপপ্রধান কুখ্যাত সাজাহান শেখের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। স্থানীয় হিন্দুরা এদের অত্যাচারের শিকার সেই সিপিএম আমল থেকেই। এরা দু'জনেই বাম জমানায় লাল ঝাণ্ডার শরণাগত ছিল। বাংলার রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে এরাও হয়ে গেছে সবুজের পূজারী। এলাকার হিন্দুদের উপর অত্যাচার তখনও যেমন ছিল, এখনও ঠিক তেমনই আছে। এই ঘটনায় মানুষ প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলেও তাদের প্রতিবাদের ভাষা স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য ওসমান এবং সাজাহানের বাহিনী লাগাতার এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বলে অভিযোগ।

সদ্য পাওয়া খবরে জানা গেছে যে হিন্দুদের উপর ব্যাপক মারধোর চলছে। বহু হিন্দু আহত হয়েছে, পুলিশ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সাহস নেই কারো। এলাকায় হিন্দুরা সার্বিক সন্ত্রাসের শিকার। এলাকায় বিজেপি নেতারা আসায় ঘটনাটিতে রাজনৈতিক রং চড়ে গিয়েছে।

অস্ত্রসহ ধরা পড়ল দুই দুষ্কৃতি

বৃহস্পতিবার (১৩ই এপ্রিল) অস্ত্রসহ দুই যুবককে গ্রেপ্তার কররলো কড়েয়া থানা ও বন্দর থানার পুলিশ। পুলিশ জানায়, ধৃতদের নাম শামশের আলি এবং সরফে আলম। সরফে আলম ভূকৈলাস রোডের বাসিন্দা। তাদের দুজনের কাছ থেকেই একটি করে এক নলা বন্দুক এবং কার্তুজ পাওয়া গেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, শামশেরকে এদিন ধরা হয় রাইফেল রেঞ্জ এলাকা থেকে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানায়, ধৃত শামশের ২০১৩ সালে কসবার একটি খুনের মামলার সঙ্গেও জড়িত ছিল। কিন্তু ফেরার হয়ে যাওয়ায় পুলিশ তখন তাকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। দুই অভিযুক্তকেই শুক্রবার আদালতে তোলা হয়েছে।

দুষ্কৃতিদের তাণ্ডবে চড়কপূজা ভণ্ডুল

সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ করিমপুরে

নদীয়ার করিমপুর ব্লকের যমশেরপুর গ্রামে এবছরের চড়কপূজা ভণ্ডুল হয়ে গেল দুষ্কৃতিদের তাণ্ডবে। পুলিশের উপস্থিতিতেই চলল ইট, তীর, বোমা এবং গোলাগুলি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়। যমশেরপুর গ্রামের চকপাড়ায় চড়ক পূজার মাঠটি যমশেরপুর হিতসাধনী ট্রাস্টের মালিকানাধীন। বিগত একশ বছর ধরে এই মাঠে হিন্দুদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়ে আসছে। ট্রাস্টের বদান্যতায় স্থানীয় মুসলমানেরা তাদের মহরমের তাজিয়া এই মাঠে রাখার সুযোগ পেয়ে থাকে। সমস্যা প্রথম তখন শুরু হয় যখন গত কয়েক মাস আগে ওই মাঠের পূজাবেদী সংস্কারের সময় মুসলমানেরা আপত্তি জানায় এবং হোগলবেড়িয়া থানায় লিখিত অভিযোগ জানায়। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ সেই নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেয়। পরবর্তীকালে আবার একটি হরিনাম সংকীর্তনের আয়োজন করা হয় এই মাঠে। কিন্তু মুসলমানদের আক্রমণে সেই সংকীর্তন করা সম্ভব হয় না। অবশেষে পরম্পরাগত চড়কমেলার প্রস্তুতি চলাকালীন পুলিশের পক্ষ থেকে ১৩, ১৪ ও ১৫ এপ্রিল ওই মাঠে কোনরকম অনুষ্ঠান ও জমায়েতের উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকে। পুলিশ প্রশাসনের এই পক্ষপাতপূর্ণ আচরণে ক্ষুব্ধ হিন্দুরা ১৪ই এপ্রিল সেই মাঠে জড়ো হলেও প্রশাসনের অনুরোধে নিষিদ্ধ এলাকার বাইরে অনুষ্ঠান করতে সম্মত হয়। কিন্তু সেই অনুষ্ঠান শুরু হতেই মুসলিম দুষ্কৃতিরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হিন্দু ভক্তদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। রণজিত ঘোষ, প্রসেনজিত ঘোষ, দেবাশিষ মণ্ডল, অশোক দাস বৈরাগ্য সহ আরও অনেকে বোমার আঘাতে গুরুতর আহত হন। রণজিত ঘোষকে কলকাতায় এন আর এস হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে এবং অন্যান্য আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সূত্রের খবর অনুযায়ী এস.ডি.পি.ও.-র পায়েও ইঁটের আঘাত লেগেছে। পুলিশের উপস্থিতিতেই হিন্দুদের ঘরবাড়িতে আগুন লাগানো হয়। সন্তোষ সাহা, সনৎ সাহা, সুকদেব সাহাদের ঘর সহ আরও বেশ কয়েকটি ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তিনজন হিন্দুসহ মোট ১২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ১৫ই এপ্রিল অভিযুক্তদের তেহট্ট আদালতে তোলা হলে সেখান থেকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতে পাঠানো হয়। স্থানীয় মানুষের বক্তব্য অনুসারে পুলিশ এই ঘটনায় মুসলমানদের চাপের কাছে সম্পূর্ণ নতিস্বীকার করেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, স্থানীয় জনৈক মৌলভি বদরুদ্দিনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলে প্রতিবাদে মুসলমানেরা করিমপুর-বহরমপুর রোড অবরোধ করে। পরে পুলিশ এই অভিযুক্তকে থানা থেকেই ছেড়ে দেয়।

এই সম্পূর্ণ ঘটনায় স্থানীয় হিন্দুরা প্রশাসনের উপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। তাদের কথায়, পুলিশ এবং প্রশাসন নির্লজ্জভাবে পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করছে। মুসলমানদের অন্যায় চাপের কাছে নতিস্বীকার করে হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বাধা দানের পুলিশর প্রশাসনের এই ভূমিকা এলাকায় দেখে মানুষ মনে করছে যে নদীয়া জেলাটা কি বাংলাদেশ হয়ে গেল? গত বছর এই তেহট্ট-তেই জগদ্ধাত্রী পূজায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় পুলিশের গুলিতে একজন হিন্দু মারা যায়।

সাতদিনব্যাপী বাসন্তী নাগরিক সংস্থার আহ্বানে এক নাম সংকীর্তন সভার আয়োজন করা হয়। সভার আয়োজক সুদর্শন হরিনাম সভা সমিতি। কর্তৃপক্ষ ২৯শে এপ্রিল হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ মহাশয়কে আমন্ত্রণ জানায়। প্রশাসনের গ্রেপ্তারের হুমকি থাকা সত্ত্বেও তপন ঘোষ উক্ত সভায় যান এবং তাঁর মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। (চিত্র উপরে ও নিচে)

সেই কড়েয়া থানা, সেই সেলিম এবার শ্লীলতাহানির অভিযোগ

দশ বছরের এক বালিকার শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল। ১১-ই এপ্রিল শুক্রবার বিকালে ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতার কড়েয়া থানা এলাকায়। পুলিশ জানায়, তিলজলা-শিবতলা লেনের বাসিন্দা বছর দশেকের এই মেয়েটি এ দিন দোকানে খাবার কিনতে বেরিয়েছিল। তখন সেলিম নামে এক ব্যক্তি মোটরবাইকে এসে মেয়েটির হাত ধরে টানাটানি এবং শ্লীলতাহানি করে। এমনকি তাকে জোর করে বাইকে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করে। নিরুপায় হয়ে মেয়েটি চিৎকার করলে এলাকার বাসিন্দারা ছুটে আসেন। বিপদ বুঝে মেয়েটিকে ফেলে সেলিম পালায়। সন্ধ্যায় ওই বালিকা তার বাবাকে নিয়ে সেলিমের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করে। উল্লেখ্য, এর আগে আমিনুল-কাণ্ডে দুই কিশোরীকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠেছিল শাহাজাদা বক্স ও তার সঙ্গী এই সেলিমের বিরুদ্ধে। কিন্তু সাক্ষ্যের অভাবে আদালতে কোন অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। দুজনেই ছাড়া পেয়ে যায়। শুক্রবার রাত পর্যন্ত সেলিমকে ধরতে পারেনি পুলিশ।

সেলিম এলাকায় কুখ্যাত বলেই পরিচিত। বিভিন্ন অসামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে সে জড়িত। একাধিক মেয়ের শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এ হেন একজন দুষ্কৃতি কিভাবে প্রশাসনের নজর এড়িয়ে এলাকায় ঘুরে বেরিয়েছে তা অনেকেরই প্রশ্ন। এবার পলাতক সেলিমকে পুলিশ কতদিনে গ্রেপ্তার করে সেটাই দেখার।

পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি লোকসভা আসনের মধ্যে যে কটি আসনে মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাত ২০ শতাংশের বেশি

১।	জঙ্গীপুর	—	৬৩.৭০	১৪।	রানাঘাট	—	২৫.৪০
২।	বহরমপুর	—	৬৩.৭০	১৫।	হাওড়া	—	২৪.৪০
৩।	মুর্শিদাবাদ	—	৬৩.৭০	১৬।	উলুবেড়িয়া	—	২৪.৪০
৪।	মালদহ (উঃ)	—	৪৯.৭০	১৭।	কুচবিহার	—	২৪.২০
৫।	মালদহ (দঃ)	—	৪৯.৭০	১৮।	বনগাঁ	—	২৪.২০
৬।	রায়গঞ্জ	—	৪৭.৪০	১৯।	ব্যারাকপুর	—	২৪.২০
৭।	বোলপুর	—	৩৫.১০	২০।	দমদম	—	২৪.২০
৮।	বীরভূম	—	৩৫.১০	২১।	বারাসত	—	২৪.২০
৯।	জয়নগর	—	৩৩.২০	২২।	বসিরহাট	—	২৪.২০
১০।	মথুরাপুর	—	৩৩.২০	২৩।	বালুরঘাট	—	২৪.০০
১১।	ডায়মণ্ডহারবার	—	৩৩.২০	২৪।	কলকাতা (দঃ)	—	২০.৩০
১২।	যাদবপুর	—	৩৩.২০	২৫।	কলকাতা (উঃ)	—	২০.৩০
১৩।	কৃষ্ণনগর	—	২৫.৪০				

(সূত্রঃ বিজনেস্ স্ট্যান্ডার্ড, এপ্রিল ২০১৪)

কুমিল্লার হোমনায় ৩৫টি বাড়িঘর, একটি মন্দির ভাঙচুর হামলায় অংশ নেয় পাঁচটি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা

কুমিল্লার হোমনার বাকসীতারামপুরে ফেসবুকে মহানবী (সা.) সম্পর্কে কটুক্তির গুজব ছড়িয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের ৩৫টি বাড়িঘর ও একটি মন্দির ভাঙচুর করেছে বিক্ষুব্ধ লোকজন ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা। গত ২৭ এপ্রিল, রবিবার দুপুর ১-০০টায় অন্তত দুঃহাজার লোক হামলা চালিয়ে এ ঘটনা ঘটায়। ভাঙচুরের পর ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে। হামলার সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। তারা এখনও আত্মগোপন করে আছে।

স্থানীয় সূত্র, পুলিশ ও ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সদস্যরা জানান, কুমিল্লার হোমনা উপজেলার চান্দেরচর ইউনিয়নের বাকসীতারামপুরের পাশের মুরাদনগর উপজেলার বাঁশকাইট্টা এলাকার কিছু লোক শনিবার মাগরিবের নামাজের পর বাকসীতারামপুরের চানমোহন দাসের ছেলে উদ্ভব চন্দ্র দাস ও অনিল দাসের ছেলে ছিনিবাস চন্দ্র দাসের বিরুদ্ধে ফেসবুকে মহানবী (সা.)কে কটাক্ষ করার অভিযোগ তুলে মিছিল করে। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় লোকজন রাতেই বৈঠক করে মীমাংসার চেষ্টা করে কিন্তু বৈঠকে মীমাংসা না হওয়ায় রবিবার দুপুর ২টার দিকে আবার বৈঠক আহ্বান করে। কিন্তু দুপুরে আর বৈঠক হয়নি। হঠাৎ করে মুরাদনগরের বাঁশকাইট্টা ও আশপাশের বিক্ষুব্ধ লোকজন ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা জড়ো হয়ে বাকসীতারামপুরের হিন্দুদের ৪০টি ঘরের মধ্যে ৩৫টি ঘর ভাঙচুর ও তছনছ করে। এর মধ্যে এ সময় তারা চানমোহন দাসের ছেলে উদ্ভব চন্দ্র দাস ও অনিল দাসের ছেলে শ্রীনিবাস চন্দ্র দাসের বাড়িঘর, ডা. রামপদ, স্বপন, তপন, প্রহ্লাদ, সহদেব সাহার বাড়িঘর সহ অন্যদের বাড়িঘর ভাঙচুর করে। এ সময় ডাক্তার বাড়ির রাধাকৃষ্ণ সমাধি মন্দিরের মূর্তি ভাঙচুর করে। হামলার সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের তৈজসপত্রও ভাঙচুর করা হয়।

দুপুর ২-০০ টা থেকে ৫-০০টা পর্যন্ত এই তাণ্ডব চলে। ঘটনার খবর পেয়ে বিকেলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলেও এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। হোমনা থানার অফিসার ইনচার্জ আসলাম শিকদার জানান, পরিকল্পিতভাবে গুজব ছড়িয়ে বিএনপি ও জামায়াত শিবিরের লোকজন এ হামলা চালিয়েছে। কুমিল্লার পুলিশ সুপার টুটুল চক্রবর্তী জানান, ঘটনাটি সম্পূর্ণ পরিকল্পিত। এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অভিযোগ উঠেছে ব্লগে বা ফেসবুকে কিছু লেখা হয়েছে কিন্তু আমার প্রাথমিকভাবে এর প্রমাণ পাইনি। বিষয়টি গভীরে গিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনার সঙ্গে বিএনপি-জামায়াতের লোকজন জড়িত বলে তিনি জানান।

সিরাজগঞ্জে গ্রামপাঙ্গানী বাজারের মন্দিরে ৬টি প্রতিমা ভাঙচুর

সিরাজগঞ্জে একটি কালীমন্দিরের ছয়টি প্রতিমা ভাঙচুর করেছে মুসলিম জেহাদিরা। বৃহস্পতিবার (২৪ এপ্রিল) গভীর রাতে উপজেলা পাঙ্গানী বাজার-এর গ্রামপাঙ্গানী কালীমাতা মন্দিরে এ ঘটনা ঘটেছে। মুসলিম দুষ্কৃতিরা রাতের অন্ধকারে এসে মন্দিরের বিগ্রহগুলি ভেঙে দেয়। মন্দির পরিচালন কমিটির সভাপতি প্রফুল্ল চন্দ্র দাস জানান, ভোরে মন্দিরে গিয়ে দেখি প্রতিমাগুলো ভাঙা অবস্থায় বিভিন্ন স্থানে পড়ে রয়েছে। দুষ্কৃতির দল লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ ও কার্তিক সহ ছয়টি প্রতিমার হাত-পা ও মাথা ভেঙে ফেলেছে। মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে থানায় বিষয়টি অবগত করা হয়। এরপর বেলা ১২টা নাগাদ, ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ গ্রামপাঙ্গানী গ্রামের মৃত মুজিবর রহমানের ছেলে জুলফিকার আলি ভুট্টো (৪০) ও একই গ্রামে মৃত ছন্দের আলির ছেলে সামিদুল ইসলাম ফকিরকে আটক করেছে। বিগ্রহ ভাঙার ব্যাপারে থানায় একটি কেস্ দায়ের করা হয়েছে। কেস্ নং ১০/৪।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.org>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, <www.hindusamhatibangla.com>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Bikarna Naskar, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012